অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

অ্যালবাম

আমাদের কিছুই আর ভালো লাগছিল না। জাহাজ কবে দেশে ফিরবে জানি না। মাসের পর মাস দরিয়ার ভাসছি। বন্দরে মাল নামাচ্ছি। মাল তুলছি। জাহাজঘাটায় তবু দিন কেটে যায়। জাহাজে নানা কিসিমের কিনারার মানুষ উঠে আসে। তাদের সঙ্গে আলাপ হয়। কেউ আসে—সস্তায় টোবাকো নিয়ে। কেউ সেকেন্ড হ্যান্ড। মার্কেট থেকে কেনা কোট-প্যান্ট জ্যাকেট—কিংবা গাউন। তারপর বিকেলে ছুটি হলে ঘুরে বেড়াও। কার্নিভালে যাও। সস্তায় মদ গেলা যায় সি-ম্যান মিশানগুলিতে। ফলে দিন কেটে যায়। সবচেয়ে খারাপ লাগে জাহাজ সমুদ্রে ভেসে গেলে। যতদূর চোখ যায় শুধু নীল জলরাশি।

সেই কবে কলকাতা থেকে জাহাজে সাইন করে উঠেছি—আর দেশে ফেরার নাম নেই।

ব্যাংক লাইনের জাহাজ এরকমেরই। মাতামুণ্ডু ঠিক নেই। জাহাজ কোথায় যাবে, কবে ছাড়বে, কোন বন্দরে কতদিন লেগে যাবে এবং কবে জাহাজ আবার কোথায় যাচ্ছে দুদিন আগেও জাহাজিরা জানতে পারে না। জাহাজ ছাড়ার চব্বিশ ঘণ্টা আগে বোর্ডে নোটিশ ঝুলত—কোথায় জাহাজ যাবে, আমরা খবর পেতাম।

ইদানীং বুড়ো ডেকসারেঙ ছাড়া সবাই বেশ মনমরা। ইঞ্জিন সারেঙও বেশ আছেন। যেন সদ্য দেখছেন—আরে বোঝে না কেন—কত দেশ, কত মানুষ সারা দনিয়া চষে বেড়াচ্ছ, সোজা কথা যত লম্বা সফর তত লম্বা বোটখানা। নামার সময় এককাড়ি টাকা পাবা

সোজা কথা। তা ঠিক—যত, লম্বা সফর তত বেশি টাকা—শেষের দিকে দেড়-দু’গুণ টাকা কোম্পানিকে গচ্চা দিতে হয়। তবু ব্যাং লাইনের জাহাজে একবার বের হলে কবে দেশে ফেরা যাবে কেউ বলতে পারে না। সারেঙের এক কথা, কোম্পানির মর্জি। বিনি মাগনায় তো কাজ করছ না। তবে এত মুখ গোমড়া কেন বুঝি না। জাহাজে ওঠার সময় মনে ছিল না! সাইন কে করতে।

সারেঙসাবও যে মিথ্যা চোটপাট করছেন না বুঝি। আমাদের মাথা গরম, জাহাজ যাচ্ছে, মাটি টানার কাজে। ব্রিটিশ ফসফেট কোম্পানির সঙ্গে নাকি চুক্তি সারা। অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে ফসফেট এনে ফেলতে হবে। নিউ ক্যাসেল, সিডনি, জিলঙ—এমন সব বন্দরের নামও শুনেছিলাম। জাহাজ অকল্যান্ডের জাহাজঘাটায় ভিড়ে আছে। খবরটা এনেছে কোয়ার্টার মাস্টার হাপিজুর। সে-ই পিছিয়ে এসে বলল, হয়ে গেলা ন-দশ মাস কাবার।

তার মানে আরও ন-দশ মাস! সারেঙসাব খবরটা পেয়ে খুশিই দেখলাম। দু আড়াই বছর—মাথা খারাপ হয়ে যাবার যোগাড়—শুধু জল আর নীল আকাশ, ঝড় সাইক্লোন। কখনো গভীর বৃষ্টিপাত অথবা জ্যোৎস্নারাতে গভীর সমুদ্রে আমাদের ডেকে বসে থাকা। ঘুম আসে না।

সবচেয়ে খারাপ লাগছে বেচারা সতীশের কথা ভেবে। সবে বিয়ে করে ব্যাটা জাহাজে এসে উঠেছে। কলকাতার ঘাটে সে সাইন করার পরও রাতে জাহাজে থাকত না। তা নতুন শাদি, সারেঙসাবের কোমলমতিতে টুটাফাটা দাগ থাকতে পারে—তিনি বলতেন, যা। সকাল সকাল চলে আসিছ। কেউ যেন টের না পায়। জাহাজ ছাড়ার আগে সে একদিন বউয়ের রান্নার হাত কত মিষ্টি, পরখ করবার জন্য আমাদের বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে

গেছিল। ভারি সুন্দর মিষ্টি দেখতে লাজুক। সতীশের মা-বাবাও খুব খুশি আমরা যাওয়ায়। রবিবার বলে সারাদিন সতীশের বাড়িতে চুটিয়ে আড্ডা, তাস খেলা, এবং প্রায় সোরগোলের মধ্যে তার বউকে দেখেছিলাম—চুপিচুপি সতীশকে ফাঁক পেলেই ডেকে নিয়ে যাচ্ছে। ফিরে এল মসকরা—কি দিল!

কি দেবে আবার!

শালো, তুমি কি করে এলে বল!

আরে না, তোরা কখন খেতে বসবি জানতে চাইল।

ফের মিছে কথা!

সতীশ বেচারা হেসে ফেলত।

বল কি করেছিস! বউটাকে একদণ্ড বিশ্রাম দিচ্ছিস না!

জাহাজ মাটি টানার কাজ নিয়েছে শুনে সেই সতীশ খুবই ভেঙে পড়ছ। খুব হিসেবি সতীশ।

বউ-এর জন্য টাকা বাঁচাচ্ছো। বন্দরে নেমে কেনাকাটা যা-কিছু বউকে খুশি করার জন্য। বন্দরে যে-কদিন থাকা হয়, রোজ বউকে একটা চিঠি। সাঁজবেলায় সবাই যখন শহরে ঘুরতে বের হয়, সে তখন ব্যাংকে শুয়ে বউকে চিঠি লেখে। কখনো লুকিয়ে বউ-এর ছবি দেখে। লুকিয়ে না দেখে উপায়ও নেই। কারো সামনে পড়ে গেলে, ফটোটা নিয়ে টাটানি শুরু হয়। এটা সতীশ একদম পছন্দ করে না। তার একটা যে গোপন পৃথিবী আছে,

সেটা যেন খোলামেলা হয়ে যায়। সে জাহাজে উঠে তার বউ-এর ছবিগুলি না দেখালেই ভালো করত। বিয়ের সময় তার যত ছবি তোলা হয়েছিল, তার সব কপি সঙ্গে এনেছে। সে না দেখালে অবশ্য আমরা জানতেও পারতাম না। সমুদ্র সফরে এই ছবিগুলি তার সঙ্গে আছে। বন্দর এলেই সে ছবিগুলি দেখার সুযোগ পায়। এক ফোকসালে আমরা। চারটা ব্যাংকে চার বাঙালিবাবু। সতীশ, নিমাই, অপরেশ আর আমি। সমুদ্রে নানা কাজ থাকে। সকালে একসঙ্গে উঠতে হয়। ডেকে জল মারতে হয়। তারপর চা চাপাটি খেতে হয়। তারপর কশপের ঘরে খেতে হয়। স্টোর রুম থেকে যে-যার মতো দড়িদড়া বের করে নেয়। তক্তা বের করে নেয়। কারও রঙের কাজ, কারো চিপিংয়ের কাজ। কেউ ফোকসালে অবশ্য তখন কাজে ফাঁকি দিয়ে ঢুকে যেতে পারে। তবে ডেকরেঙের সতর্ক নজর। তারপর দুপুরে ভাত-ডাল-সবজি, গোস্ত। আবার কাজা। পাঁচটা না বাজলে কাজ থেকে ছুটি হয় না। তখনও ফোকসালে লোজন থাকে। সে যে গোপনে বউ-এর ছবি দেখবে, তারও উপায় নেই। একমাত্র ফুরসত মেলে জাহাজ ঘাটে ভিড়লে। সবাই বন্দরে নেমে গেলে ফোকসাল ফাঁকা।

এ-সময়টাতেই তার সুযোগ। সে জাহাজঘাটায় এক-দু-দিন বন্দরে যে নামে না, তা নয়। তবে তার কাছে বন্দরের সুন্দরী যুবতীদের আকর্ষণের চেয়ে বউ-এর ফটো দেখার আকর্ষণ অনেক বেশি। সে এই করে পনেরো-যোলো মাস জাহাজে কাটিয়ে দিয়েছে। কখনো বৌকে চিঠি লিখে, কখনো তার বউ-এর চিঠি পড়ে, ছবি দেখে তার সময় কেটে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে সে হাই তুলত। রাতে এপাশ-ওপাশ করত। ঘুমোতে পারত না। উঠে জল খেত। ঘুম ভেঙে গেলে একদিন টের পেয়েছিলাম, সতীশ ফোকসালে নেই। গেল কোথায়? বাথরুমে যেতে পারে। বেশ ঠান্ডা পড়েছে। কনকনে শীত। আমরা কম্বল

মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছি। জাহাজ যাচ্ছে ফিজিতে। সেখান থেকে মাটি কাটার কাজ শুরু হবে। ফিজি থেকে প্রায় দেড়-দু হাজার মাইল আরও ওপরে অজস্র ফসফেটের দ্বীপ আছে। সেইসব দ্বীপ থেকে সফেট বোঝাই করে অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে খালাস করতে হবে। কনকনে শীতে ফোকসালের বাইরে কোথায় গেলা। বাথরুমে যেতে গেলে সিঁড়ি ভাঙতে হয়। যদি গিয়ে থাকে, ফিরে আসবে। কিছুটা মানসিক অবসাদে ভুগছে সতীশ, টের পাচ্ছিলাম। জাহাজে এটা মারাত্মক রোগ। আমরা সতীশকে সাহস দিতাম। বলতাম, দেখতে দেখতে কেটে যাবে কটা মাস। এত ভেঙে পড়ছিস কেন! সে কথা বলত না। সিগারেট টানত ঘনঘন। মাঝে মাঝে পোর্টহোলে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখত।

সেই সতীশ না নেমে এলে ভয়ের। কম্বল মুড়ি দিয়ে আর তো শুয়ে থাকা যায় না। আবার কাউকে ডাকাও যায় না। হয়তো দেখা যাবে সতীশ গ্যালিতে কনকনে ঠান্ডা থেকে শরীর গরম করার জন্য চা বানাচ্ছে। কিংবা রেলিঙে দাঁড়িয়ে, নিশীথে সমুদ্র দেখতে দেখতে দেশের কথা ভাবছে। ঘুম না হলে আমরাও ডেকে উঠে গেছি কতদিন। ফল্কার ওপর মাদুর পেতে শুয়ে থেকেছি। মাস্তুলের আলো দুলছে। জাহাজ দুলছে। মনে হচ্ছে আকাশ কখনো ঝপাত করে মুখের সামনে নেমে এসেছে। আবার ঝপাত করে উঁচুতে উঠে গেছে। এটা দেখতে দেখতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি টের পাইনি। গরমের সময় প্রায় জাহাজিরাই ফোকসাল থেকে উঠে আসে। উপরে সমুদ্রের ঠান্ডা হাওয়া। বেশ আরাম বোধ করা যায়। কিন্তু এই প্রচণ্ড ঠান্ডায় উপরে উঠে গেলে হাত-পা টাল মেরে যায়। সারা গায়ে কনকনে শীতের সূচ বিঁধতে থাকে। কখন গেল, কোথায় গেলা! আর তো শুয়ে থাকা যায় না। কম্বল গায়েই সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে গেলাম। গ্যালির দরজা বন্ধ। মেসরুমের দরজা বন্ধ। ব্রিজে সেকেন্ড অফিসার আর কোয়ার্টার মাস্টার। কাচের

ঘর বলে, বুঝতে কষ্ট হয় না—কোয়ার্টার মাস্টার হুইলে হাত রেখে দূরের সমুদ্র দেখছেন। সেকেন্ড অফিসার ব্রিজে পায়চারি করছেন। এখন সেকেন্ড অফিসারের ডিউটি মানে, রাত একটার ওয়াচ চলছে। গেল কোথায়! ইঞ্জিন রুমে! সেখানে তার কী কাজ থাকতে পায়ে! বাথরুম খালি, গ্যালি বন্ধ, মেসরুমের দরজাও বন্ধ। ডেক, ফলকা, এলিওয়ে সব খালি—এই নিশীথে জেগে থাকার কথা একমাত্র ইঞ্জিন রুমে যারা ডিউটি দেয়।

খুবই ফাঁপরে পড়ে গেলাম।

কোথায় আর যেতে পারে এই ঠান্ডায়। ঝড়ো হাওয়ায় সমুদ্র বেশ ক্ষেপে উঠেছে। আকাশে মেঘ নেই, তবু বরফঠান্ডা ঝড়ো হাওয়া। কম্বল উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে।

তারপরই মনে হল, মেসরুম তো বন্ধ থাকায় কথা নয়। দরজা কে বন্ধ করল! রাতের পরিদাররা তো ওয়াচ শেষ করে হাতমুখ ধুয়ে মেসরুমে বসে সিগারেট খায়। দরজা খোলা থাকারই কথা। সারা জাহাজ ঘুরে যখন কোথাও পাওয়া গেল না, ছুটে এলাম, যদি মেসরুমে দরজা বন্ধ করে কিছু করে বসে। দরজা দেখি ভিতর থেকে বন্ধ। ডাকলাম, কে ভিতরে? সাড়া নেই।

অগত্যা পোর্টহোল দিয়ে উঁকি দিতেই দেখি সতীশ তাস সাজাবার মতো ফটোগুলি সাজিয়ে বসে আছে। প্রায় বেঘোরে পড়ে গেছে ছবিগুলি দেখতে দেখতে–এক তরুণীর স্তন নাভি অধর আরও গভীর অভ্যন্তর ভেসে বেড়াচ্ছে বোধহয় সতীশের .....

ডাকলাম, এই, কি হচ্ছে, হ্যাঁ। বসে বসে কী করছিস। এই তোমার কাজা! হ্যাঁ বউকে দেখছ সবার গোপনে বউকে দেখছ। আমরা তোমার বউকে খেয়ে ফেলব।

সতীশ কেমন চমকে গেল। সে ভাবতেই পারেনি, গ্যালির উলটোদিকের পোর্টহোলে কেউ এতে উঁকি মারতে পারে। এত উপরে উঠে ... পোর্টহোলে কেউ মুখ গলাবে—কার এত দায়-সমুদ্রের ঝড় উড়িয়ে নিলে রক্ষা করবে কে? আমাকে

এতটা বিপদের মুখে ফেলে দেওয়া যেন তার ঠিক হয়নি। সে দু-হাতে তাড়াতাড়ি সাপটে ফটোগুলি তুলে ফেলল। তারপর দৌড়ে এসে পোর্টহোলের কাছে দাঁড়াল। চোখেমুখে প্রচণ্ড ক্লেশ ফুটে উঠেছে। ভয়ে সচকিত গলায় বলল, নাম, নেমে যা লক্ষ্মী ভাইটি। ঝড়ে উড়েফুড়ে গেলে কেলেঙ্কারি।

দরজা খোল।

খুলছি। তুই নাম। তোর ভয়ডর নেই।

জীবনের মায়া নেই!

দরজা খোল।

খুলছি।

পোর্টহোল থেকে নামছি না দেখে সে যেন অগত্যা দরজা খুলে দিল। একলাফে নেমে এল দরজায়।

কী করছিলি!

সে ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল—হিস।

তারপর বাইরে বের হয়ে বলল, কাউকে বলিস না। কেমন অপরাধীর গলা। নিজের বৌ-এর ফটো লুকিয়ে দেখা কী এমন অপরাধ বুঝলাম না। সে এই ফটো দেখে সারা সফর কাটিয়ে দিতে পারলে মন্দ কি! কিন্তু যা আমাদের ভাবিয়ে তুলছে, তা জাহাজে থাকলে, সবাইকে ভাবিয়ে তুলতে পারে। সে হাসে না। কথা বলে না। কাজে কোনো জুস পায় না। খেতে পারে না ভালো করে। অনিদ্রা। এগুলো জাহাজির ভালো লক্ষণ নয়।

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় সতীশ বড়ো কাতর গলায় বলল, কাউকে বলিস না।

খেপে গেলাম। বোধহয় চিৎকার করেই উঠতাম। এত রাতে তবে আর একটা নাটক হয়ে যাবে পাশাপাশি কোন পালে যারা থাকে, তারা দরজা খুলে ছুটে আসতে পারে। নানা প্রশ্ন করতে পারে। কারণ দীর্ঘ সফরে জাহাজিদের মাথা ঠিক থাকে না, সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়, কেউ উন্মাদ হয়ে যায়—ঠিকঠাক আর দেশে ফেরা হয়ে উঠে না। সতীশকে নিয়ে অনেকের মনেই এ-ধরনের সংশয় দেখা দিয়েছে। হয় আমাকে, নয় অপরেশকে সারেঙ ডেকে সতীশের খোঁজখবর নেয়। দেশ থেকে ওর চিঠি এল কিনা, চিঠিতে কোনো খারাপ খবর আছে কিনা—সতীশ দিন-দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে। আমরাও বলছি, না তো, দেশ থেকে তো চিঠিপত্র ঠিকই আসছে। বউ-এর জন্য লম্বা সিল্কের নাইটি কিনেছে বলতে পারতাম। কিন্তু সারেঙসাব বুড়ো মানুষ—তাকে এমন খবর দিলে যেন সতীশকে ছোটো করা হবে। ওর বৌয়ের মর্যাদা রক্ষা হবে না। কিছু না অশালীন ইঙ্গিত থেকে যায়

এমন খবরে! কাজেই চুপ করে যেতাম। কিন্তু ফোকসালে ঢুকে দেখি অপরেশ, নিমাই বসে আছে। ওরা হয়তো আমাদের খুঁজতে উপরে উঠে যাবে ভাবছিল। আমাদের দেখেই বলল, কি রে, কোথায় গেছিলি এত রাতে! কিছু বললাম না। চুপ করে থাকলে সন্দেহ বাড়ে। আমাকে নিয়ে তাদের ভয় নেই। কারণ তারা জানে, আমি কিছুটা খোলামেলা স্বভাবের। আমার খুব-একটা শুচিবাই না থাকলেও কোনো নারীসংসর্গে যেতে যে রাজি না তারা জানে। তারা নিজেরাও বন্দরে নারীসংসর্গ করে না। কারণ দুরারোগ্য ব্যাধির ভয় কার না থাকে। ডালভাত খাওয়া বাঙালি যেমন হয়ে থাকে—বরং আমাদের উপাস্য দেবী বলতে কিছু নারীর উলঙ্গ অ্যালবাম। যা দেখলে মানসিক অবসাদ থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। জাহাজের একঘেয়ে খাওয়া, একঘেয়ে সমুদ্রযাত্রা, একঘেয়ে ঝড়-সাইক্লোন, নীল আকাশ, এবং নক্ষত্রমালা—সবই বড়ো তিক্ততার সৃষ্টি করে। সেখানে বন্দরে কোনো নারীর হাতছানি অবহেলা করা খুব কঠিন। সতীশের শুচিবাই তাকে কিছুটা আলগা করে রেখেছে আমাদের কাছ থেকে। নারী সম্পর্কে সে কোনো অশ্লীল কথা পর্যন্ত বলে না। আমাদের প্রিয় অ্যালবাম থেকে তাকে কত চেষ্টা করেছি নরনারীর সংসর্গের ছবি দেখাতে। ওটা ছুঁলেও যেন পাপ। দেখলে নরকবাস। অথচ আমরা জানি, আমাদের শুচিবাই কম। আমরা এইসব ছবি নিয়ে হেসেখেলে মজা করতে পারি। এতে বোধহয় থাকে কঠিন সব উপসর্গ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়। আমরা সহজেই তারপর জাহাজ ঘাটে ভিড়লে শিস দিয়ে নেমে যেতে পারি—সুন্দরী যুবতীকে ফুল উপহার দিতে পারি—কার্নিভালে ঢুকে যে-কোনো যুবতীর সঙ্গে রঙ্গরসে মজে যেতে পারি—শুধু সহবাস ছাড়া আমাদের যেন আর কিছুতেই আপত্তি নেই। আমরা এজন্যও বাকি ন-দশ মাস জাহাজে থাকব ভেবে ভেঙে পড়ছি না।

অপরেশ যে বেশ খেপে আছে, বোঝাই গেল।

সে উঠে গিয়ে ফোকসালের দরজা বন্ধ করে দিল। দরজা বন্ধ করলে বাইরে থেকে ভেতরের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।

অপরেশ ব্যাং-কে বসে একটা সিগারেট ধরাল। তারপর তাকাল সতীশের দিকে। সতীশ তার ব্যাংকে এসে শুয়ে পড়েছে। কম্বলের ভিতর খামে সব ফটো, সেগুলি বালিশের নীচে লুকিয়ে ফেলেছে। আমি লক্ষ করছি-অপরেশ ফুঁসছে।

অপরেশ গজগজ করছে, শালা মরবে। শালার মগজে বীর্য উঠে মরবে। বেটার কোনো ওয়ে-আউটই নেই। জাহাজে কেন মরতে এলি। বিছানায় কোনো দাগ লাগে না! সব বউ-এর জন্য জমা করে রাখছিস! জমা করলে থাকে, থাকলে পাগলের মতো উঠে যাস। কী হাড়কাঁপানো শীত! তার মধ্যে লুকিয়ে বউ-এর ফটো দেখতে উঠে গেলি!

ঠিক ধরে ফেলেছে অপরেশ।

আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কোথা থেকে ধরে আনলি!

বললাম, মেসরুম থেকে।

একসঙ্গে থাকলে, আর এতদিন এক ফোকসালে থাকলে মায়া-দয়া জন্মাতেই পারে। চিন্তা হতেই পারে। তাছাড়া সতীশের সুন্দরী বউকে আমরাও দেখেছি একদণ্ড কাছছাড়া হয় না। কিন্তু এটা যে কতবড় বিপজ্জনক খেলা একজন জাহাজির পক্ষে, ভেবেই অপরেশ ক্ষুব্ধ।

সে সোজা উঠে এল।—এই ওঠ। বলে সতীশের হাত ধরে টানাটানি করতে থাকল।

নিমাই বলল, ছাড়ো তো অপরেশদা। এত রাতে আর ঝুটঝামেলা ভাল্লাগে না।

আর ও তো মরবে।

মরবে কেন!

শোন, এমন অনেক দেখেছি! জানিস, মাথায় বীর্য উঠে গেলে পাগল হয়ে যায়। দিওয়ানা হয়ে যায়।

যা, কী যে আবোলতাবোল বকছ না?

এই উঠবি, না শুয়ে থাকবি। তোর সতীপনা বের করছি। এই নিমাই বের কর তো। ঘাড় ধরে দেখাব।

সতীশ কম্বলের নীচ থেকে হাতজোড় করল, দাদা ক্ষমা কর। আমি পারব না।

পারতে হবে। ওঠ বলছি। অনেক সতীপনা সহ্য করেছি। এখন মেসরুমে শালা, পরে সমুদ্রের তলায় যাবি—তোর তো নিরিবিলি জায়গা চাই। তুই সব করতে পারিস।

সতীশ মটকা মেরে পড়ে আছে।

অপরেশের মাথা গরম হয়ে গেছে। সে এমন একটা কাজ করে বসবে বুঝতে পারিনি। এক ঝটকায় বালিশের তলা থেকে ফটোভরতি খামটা তুলে নিল।

আর নিতেই ছুটে গেল সতীশ।

সব ফেলে দেব।

অপরেশ জেটির উপরে উঠে পোর্টহোলের কাচ খুলতে লাগল।

ওর মুখে এক কথা, আগে দ্যাখ, না দেখলে ফেলে দেব।

নিমাইকে বলল, আরে বের কর আমাদের অ্যালবাম। যেটাকেই দেখা, সব এক। তার বউ-এরটা আলাদা নয় বুঝোক। ওষুধ প্রয়োগ না-হলে বাঁচবে না। ব্যাটা সাধুপুরুষ। বউ ছাড়া কিছু বোঝে না। আট-দশ মাস সফর-করা অপরেশ আমাদের চেয়ে অভিজ্ঞ। সে বলতেই পারে। জাহাজের অসুখ সম্পর্কেও সে বেশি খবর রাখে। সতীশ অপরেশের হাত ধরে টানাটানি করছে। অপরেশ হাতটা পোর্টহোলের বাইরে রেখে দিয়েছে। ছেড়ে দিলেই সমুদ্রের নীল জলে প্রপেলারের চাকায় তছনছ হয়ে গভীর জলের অন্ধকারে ভেসে যাবে।

সতীশের কাতর অনুনয়, দোহাই অপরেশদা। পায়ে পড়ি।

দ্যাখ তবে। এই নিমাই ওর সামনে অ্যালবামটা মেলে ধর। ব্যাটা দেখুক লজ্জা ভাঙুক।

নিমাই দেখল, অ্যালবাম খুলে দিলেও সতীশ তাকাচ্ছে না।

অপরেশের হুঙ্কার, ঠিক আছে, নে এবার ঠিক ফেলে দিচ্ছি। দেখি তারপর কী। থাকে তোর। বউ মগজে সেঁটে আছে।

ফেলবে না দাদা। প্লিজ, পায়ে পড়ছি।

তাকা। দ্যাখ। দিল তোর সাফ হয়ে যাবে।

ঠিক যেন ধর্মগ্রন্থ খুলে রেখেছে নিমাই। সতীশ বলল, কী নোংরা ছবি!

দেখ না! নোংরা হোক। তবু দেখ। আমাদের ধর্মগ্রন্থ এটা, বুঝিস! পাঠ কর। ভালো করে দ্যাখ। জীবনেরও ধর্মগ্রন্থ।

সতীশ দেখছে।

দ্যাখ।

সতীশ দেখছে নিমাই অ্যালবামের পাতা উল্টে যাচ্ছে।

সতীশের আর খেয়াল নেই।

এই তবে সব! সতীশ কেমন দেখতে দেখতে নেশায় পড়ে গেল।

অপরেশ বলল, যা, ব্যাং-কে বসে দেখ। সতীশ ব্যাং-কে বসে দেখতে থাকল। কী মজা লাগছে। নারে! মহাকাব্যের উৎপত্তিস্থলটা দ্যাখ বাবা ভালো করে।

সতীশ তাকাচ্ছে না। নিবিষ্টমনে দেখছে। ইস, কী নোংরা। কেউ এভাবে ছবি তুলতে পারে। এদের লাজলজ্জা নেই দাদা! কী কুৎসিত। বমি পাচ্ছে।

শালা বমি পাচ্ছে তোমার। মারব এক থাপ্পড়। যা এবার বালিশের নীচে রেখে শুয়ে পড়। অনেক জ্বালিয়েছ। আর না। বউ-এর ফটোগুলো আমার কাছে থাকল। দরকার পড়লে চেয়ে নেবে।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত দরকার পড়েনি।

অপরেশই কলকাতার ঘাটে ফটোগুলি ফিরিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, বউকে বলবি, আর-একদিন নেমন্তন্ন করে যেন খাওয়ায়। আমরা তো খারাপ। কে কত ভালো জানা আছে! পাগল হসনি রক্ষে। এবারে অ্যালবামটা ফেরত দে।

পাচ্ছি না।

মিছে কথা বলছিস!

ধরা পড়ে গিয়ে সতীশ বলল, এটা থাক দাদা আমার কাছে। তুমি না-হয় আর একটা কিনে নিও।